১১ অগাস্ট ২০২২

গিয়াস মিয়া

আমার নাম গিয়াস মিয়া। আমার ঠিকানা ২০ কিল্‌ন ক্লোজ, পরিংল্যান্ড। আমার জন্ম ১৯৭৫ সালের ২০ অক্টোবর, বাংলাদেশের সিলেটে। ২ বছর বয়সে আমি ইংল্যান্ড চলে আসি। আমার বাংলাদেশে বড় হবার কোনো স্মৃতি নেই। তবে প্রায়ই আমি সেখানে বেড়াতে যাই, কিছুদিন আগেই ছোট্ট একটা ছুটি বাংলাদেশে কাটিয়ে এলাম। চল্লিশ ডিগ্রি গরম, তেমন আর্দ্র। এখানকার গরমের চেয়ে সম্পুর্ণ আলাদা ঐ গরম। যেহেতু আমার পরিবার বাংলাদেশ থেকে এসেছে, ফলে ওখানেই আমার ঐতিহ্য, আমার উত্তরাধিকার, আমার সংস্কৃতি, সব। আমার শরীরের সমস্ত তন্তু ওখানে থাকতে চায়, ছেলেমেয়েদেরও আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই, তাই বারবার ফিরে যাই, বছরে অনেকসময় দুইবার যাই। বৃটেন অবশ্যই আমার আরেক বাড়ি, আরেক জীবন এখানে। কিন্তু বাংলাদেশের ঐ ভিড়-ভাট্টা, ঐ সংস্কৃতি, ঐ প্রাণবন্ত বর্ণিল ব্যাপারটা আমাকে টানে, আমি ভালোবাসি।

আমার বাবা বেঁচে নেই, চার বছর আগে তিনি মারা গেছেন। মা বাংলাদেশে থাকেন। এখানে আসেন মাঝেমাঝে কিন্তু তারপর চলে যান, থাকেন না, এই আবহাওয়া তাঁর পছন্দ হয় না। মায়ের স্মৃতি? মাকে খুব ভালোবাসি, মা আমাকে জন্ম দিয়েছেন, আমার চিন্তাভাবনার আকার দিয়েছেন। আজ আমি যা, তা তো মায়ের কারণেই। মাকে যখন অনেকদিন পর দেখি, জড়িয়ে ধরি, সেই অনুভূতি জীবনের সেরা সুখস্মৃতি। জীবনের আর আনন্দের অভিজ্ঞতা বলতে গেলে বলতে হয়, আমাদের বিয়ের দিন। আমার বাবা-মা ছিলেন, পুরো পরিবার উপস্থিত ছিলেন, বাবার চোখেমুখে সেই আনন্দের অভিব্যক্তি অবিস্মরণীয়।

আমার স্ত্রী হেনা শ্রপশায়ার থাকতেন। আমাদের অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ। প্রথম দেখা থেকে বাংলাদেশে বিয়ে হওয়ার মাঝখানে সময় দুই সপ্তাহ। যা হবার তা হয়, সেভাবেই বিয়েটা হয়। আমার শ্বশুর বাংলাদেশের একজন রাজনীতিক, তিনি খুব বড়সড় আয়োজন করে বিয়েটা দিতে চেয়েছিলেন। এখানে তো আমি নরউইচে, ও শ্রপশায়ার, তার চেয়ে দেশে বাপমায়ের উপস্থিতিতে বিয়ের অনুষ্ঠান হওয়াটাই ভালো। আমাদের বিয়ের ১৩ বছর হয়ে গেল। আমাদের চারটি সন্তান। বড় মেয়ে মানহার বয়স ১২। তারপর ছেলে আকিব আমার মতোই সে ফুটবলের পাগল, ব্লোফিল্ড ইউনাইটেডের হয়ে খেলে। তারপর আমার ছেলে আদিল, বয়স ৫। আর সবচেয়ে ছোটজন মেয়ে, ইনারা, ৩ বছর বয়স। বলতে পারেন, হইচইয়ে ভরা ঘর আমার। আমার স্ত্রী দুবাই যেতে ভালোবাসেন, তের বছরের বিবাহিত জীবনে ছয়বার দুবাই বেড়াতে গেছি। সবচেয়ে আনন্দের ভ্রমণস্মৃতি আবুধাবির এমিরেটস প্যালেসে যাওয়া। সেটা ছিল আমাদের মধুচন্দ্রিমা। আমাদের বাড়ির কাছেই প্লেজারউড হিলস, বাচ্চারা সেখানে গিয়ে খুব আনন্দ করে। ওদের সঙ্গে সময় কাটানোই আমার কাছে সবচেয়ে আনন্দের।

আমি পেশায় শেফ। ১৮ বছর বয়স থেকে আমি রান্না করি। আমি একটি রেস্টুরেন্ট ম্যানেজ করি, নাম ট্যামারিন্ড ফাইন ইন্ডিয়ান ডাইনিং, ব্লোফিল্ড হীথে অবস্থিত। দশ বছর ধরে চলছে। খুব ভালো চলছে। বাঙালি কমিউনিটির প্রাণকেন্দ্র এটা, ভেতরে গেলেই বাংলাদেশের মতন একটা অনুভূতি হবে। আমার কাস্টমাররা আমার বন্ধু, আমার আত্মীয়ের মতো। ফলে পুরো ব্যাপারটা একটা আশীর্বাদের মতো। আত্মীয়তাও তৈরি হয়েছে, পয়সাও রোজগার হচ্ছে। এই রেস্টুরেন্টকে কেন্দ্র করেই আমরা কমিউনিটির জন্য কাজ করি, দাতব্য কর্মকান্ড পরিচালনা করি। গত কয়েক বছরে আমরা বিগ সি, গ্রেট অরমন্ড স্ট্রিট, দ্য ইস্ট অ্যাংলিয়ান এয়ার অ্যাম্বুলেন্স ইত্যাদির জন্য চ্যারিটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। আমার প্রয়াত বাবা আমাদের সবসময় এদেশের জন্য কিছু করার তাগিদ দিতেন, ফলে চ্যারিটির জন্য কাজ করাটা আমার প্যাশন, আমার গর্ব। আমার বাবা আমার পরম অনুপ্রেরণা, আমার নায়ক বাবা। বাবা গ্রামকে ভালোবাসতেন, মানুষের দুঃখদুর্দশার কথা শুনতেন, তাঁদের সময় দিতেন। যা কিছু শিখেছি, তিনি শিখিয়েছেন, তিনি পথ দেখিয়েছেন। তাঁর স্মৃতি আমার হৃদয়ে অক্ষয়, যখন সেই স্মৃতি রোমন্থন করি, তখন তা আমাকে উদ্দীপ্ত করে, জীবনপথে চলবার আর কাজ করবার উদ্যম ফিরে পাই। মায়ের সঙ্গেও আমি খুব খোলামেলা, সব কথা বলতে পারি, তাঁর উপদেশ নিই।

বাবা মা নরউইচে এসেছেন, কিন্তু এখানে তাঁদের ভালো লাগেনি। তাঁরা বাংলাদেশের জীবনে অভ্যস্ত। এখানে সেই কোলাহল নেই, সেই আত্মীয়পরিজনে ভরা সমাজ নেই, সবকিছু কেমন নিয়মে বাঁধা, ছক-কাটা। তাঁরা খোলা প্রান্তর ভালোবাসেন, মুক্ত হাওয়া, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, স্বাধীনতা। এখানে দোকানে যেতে হলেও তাঁদের আমার বা আমার ভাইবোনদের বা আমার সন্তানদের ওপর নির্ভর করতে হয়। বাংলাদেশ তো তাঁদের নিজের দেশ, সেখানে ওঁরা বাংলায় কথা বলেন, ঐ আবহাওয়ায় স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন।

আমার বাড়ি বেডফোর্ডশায়ারে। বহুসংস্কৃতির মিলন সেই শহরে, স্মৃতিময় শহর। সেখানে আমি নার্সারি- প্রাইমারী এবং হাইস্কুলে গেছি। সেসময়ের বন্ধুদের সঙ্গে লকডাউনের সময় আবার আলাপ হলো, কত নিষ্পাপ সময়ের স্মৃতি ফিরে এলো। কত আপেল কুড়িয়েছি, নাশপাতি কুড়িয়েছি। বেডফোর্ডে আমি একটু বিপথে যাচ্ছিলাম, ফলে বাবা-মা স্থির করলেন আমাকে এমন কোথাও পাঠাবেন যেখানে এশীয়রা সংখ্যালঘু। ফলে ১৯৯৩ সালে নরফোক এলাম। ফেইকেনহ্যামে এসে উঠলাম, সেখানে ৯০ দশকের শুরুর দিকে বাসন মাজতাম। একসময় টের পেলাম আমি ভালো রান্না করি। সেটা আমার প্যাশনে পরিণত হলো। নরউইচ তখন ছিল ছোট্ট একটা গ্রামের মতন, অন্তরঙ্গ, শিথিল জীবনযাত্রা, এখনকার মতো মাল্টিকালচারাল ছিল না। তখন থেকেই নরউইচে আছি, এখান থেকে কোথাও যেতে চাই না, যদি যাই নিউক্যাসল-আপন-টাইন যাব। আমাদের ইপসউইচের বন্ধুরা বলে—ইপসউইচ ইস্ট অ্যাংলিয়ার সৈকত শহর, আর নরউইচে ঢুকতেই লেখা—নরউইচে স্বাগতম, ইউনেস্কোর সাহিত্য-শহর। এমন জায়গায় থাকতে পেরে আমি এতই গর্বিত যে আমার স্ত্রী বলেন, আমার নরউইচ পর্যটন বিভাগে চাকরি করা উচিত।

কোভিডের আগে আমি নরউইচ সিটি কলেজে একটা কোর্স করাতাম। আবার শুরু করবো। ‘ম্যানেজার অভ দ্য ইয়ার’ হয়েছি, ‘শেফ অভ দ্য ইয়ার’ হয়েছি। আমার রেস্টুরেন্ট যখন গোটা নরফোকে ‘রেস্টুরেন্ট অভ দ্য ইয়ার’ হয়েছে, তখন চারশো মানুষ উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানিয়েছেন। সে এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। নিজের এই জ্ঞান আর অভিজ্ঞতাকে অন্যের কাছে বিলিয়ে দিয়ে যাব। আমার ছেলেকে যখন জিজ্ঞেস করি সে রেস্টুরেন্টে কাজ করতে চায় কি না, সে বলে—না। সন্ধ্যায় কাজ করতে হয়। ওদের অন্যভাবে আকৃষ্ট করতে হবে। খাবারদাবার তো সাংস্কৃতিক বিষয়, ঐতিহ্যের বিষয়, সেটা হস্তান্তর করে যেতে হবে তো।